সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

আয়োজনে
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা
অধ্যাপক আখতার সুলতানা
চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আহ্বায়ক
রোবায়েত ফেরদৌস

সদস্য
অধ্যাপক শেখ আব্দুস সালাম
ফাহমিদুল হক
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
শাওন্তী হায়দার
আফরোজা বুলবুল

Abdus Salam Trust
University of Dhaka
Lifetime Achievement Award, Memorial Lecture and Student Scholarship Programme, 2015
Organized by Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka 1000.

আজীবন সম্মাননা
নূরজাহান বেগম

স্মারক বক্তা
কামাল লোহানী

স্মারক বক্তৃতা

মুক্তিযুদ্ধ, সাংবাদিকতা ও স্বাধীন বাংলা বেতার

কামাল লোহানী

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে এবং শ্রদ্ধেয় আব্দুস সালাম পরিবারের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত 'সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট'-এর প্রথম স্মারক বক্তৃতায় অংশ নিতে পেরে এই অশিতীপর বয়সেও নিজেকে ধন্য ও গর্বিত মনে করছি। ধন্য এজন্যে যে এমন একটি শুভ কর্মযজ্ঞের সূচনাতেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সামিল হতে পারলাম। গর্বিত, কারণ সাংবাদিকতায় অনুসরণীয় এবং সাহসী অথচ আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল এক কিংবদন্তীকে উপলক্ষ্য করে আজ আমি 'মুক্তিযুদ্ধ, সাংবাদিকতা এবং স্বাধীনবাংলা বেতার' নিয়ে কথা বলতে চলেছি আপনাদের সামনে। তাঁর নামে প্রবর্তিত স্মারক বক্তৃতার এটাই প্রথম, সুতরাং গর্বতো হবেই। সেই পাকিস্তানি জামানা থেকে আজ অবধি প্রায় ছয় দশকে নিজের অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার সুবাদে নির্দ্বিধায় বলতে পারি সেকালের সম্পাদক আব্দুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও জহুর হোসেন চৌধুরী – এই ত্রয়ীর প্রধানকে নিয়ে এই অনন্য আয়োজন হয়তো ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। কারণ এঁরা তিনজনই ছিলেন পাকিস্তানী দুঃশাসন আর সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর। সাম্প্রদায়িকতা আর সহিংসতা প্রতিরোধে তিনি নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলেন। তাই এ সাহসী অভিভাবককে জেল-জুলুম, অবমাননা সইতে হয়েছে সেকালে এবং একালেও। প্রণম্য শ্রদ্ধেয় আব্দুস সালাকে উপলক্ষ্য করে তাঁদের তিনজনের প্রতিই বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি।

...

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। সাড়ে সাত কোটি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা, লাঞ্ছনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, বৈষম্য আর নির্মম অবহেলার বিরুদ্ধে কোটি-কোটি কণ্ঠের বজ্রনিনাদ, ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ আন্দোলনের পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ। আমরা বাংলার আপামর জনগণ

অকুতোভয়ে জানবাজি রেখে প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে, যে স্বদেশ পাকিস্তানিরা দখল করে নিয়েছিল তেইশ বছর আগে (১৯৪৭ সালে); দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পর আমরা পাকিস্তানি হয়ে গিয়েছিলাম। কী নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস! আমরা গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবার পরও, নব্যশাসকগোষ্ঠী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ববঙ্গকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করে প্রথম থেকেই। পূর্ববঙ্গ সাড়ে চার কোটি মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড হওয়ার পরেও, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে অবমাননা করার মতোন ক্ষমতাদম্ভ দেখিয়েছিল। কিন্তু বাংলার তরুণ ছাত্রসমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছিল মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষার মান রক্ষা করতে দ্বিধা করে নি তারা। গণতন্ত্রের আশ্বাসে যে ভূমি রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল, সে রাষ্ট্র প্রথমেই অস্বীকৃতি জানাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাণের দাবিকে। এখানেই বীজ উপ্ত হলো মুক্তিসংগ্রামের, যে সংগ্রাম প্রাণ পেয়েছিল ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, কাজেম মাস্টার আর প্রীতিলতার সাহসী লড়াইয়ের অমিততেজ গৌরবদৃপ্ত কাহিনীতে। ওঁদের রক্তধারায় মিলিত হলো সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের তপ্ত লহু। রক্তের প্রচ্ছদপটে আঁকা হলো মুক্তিপথের নিশানা।

মুক্তির প্রশ্ন এলো কেন? পাকিস্তানি দুঃশাসনে আমাদের থাকতে হয়েছিল ২৩ বছর। এ সময়ে রাজনৈতিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সম্পদ অপহরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের অপচেষ্টা, চাকরিক্ষেত্রে অবহেলা, নিপীড়ন-নির্যাতন, সর্বোপরি বাংলার সম্পদ চুরি করে পশ্চিম পাকিস্তানে 'সাদ্দাদের বেহেশত' তৈরির সে আয়োজনে, ক্রমশ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন ক্রোধে পরিণত হলো। কিন্তু সেই অসন্তোষ দমনে যে হত্যাযজ্ঞ, রক্তিম বাংলার লড়াকু মানুষ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তাই ক্রোধ বিস্ফোরণ ঘটালো। সমগ্র জাতিসত্তার সকল মানুষের ঐক্য গড়ে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত, নিপীড়ক সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এলো মার্শাল ল', সামরিক শাসন। কিন্তু সামরিক শাসকদের ক্ষমতার লোভ এবং দ্বন্দ্ব পরস্পরের লড়াইয়ে পরিণত হলো এবং একজন দুর্ধর্ষ সামরিক জান্তা প্রধান ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানকে তারই সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান অপসারণ করে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের বদৌলতে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশের তাবৎ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে সাধারণ নির্বাচন দিলেন। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে রীতিনীতির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন তিনি। ফলে পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার – স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনে এবং পরে পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী 'লাকুম দ্বীনাকুম ওয়ালাদিন' এবং 'ওয়ালে কুম আস্‌সালাম' জানিয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা প্রদান করলেন। সামরিক শাসক নিয়ন্ত্রিত সাধারণ নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিলেন মওলানা ভাসনী ও তাঁর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। কিন্তু

ইতোমধ্যেই দমন-নিপীড়ন শুরু হলে, ১৯৬৬ সালে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠা '৬ দফা' দাবির ভিত্তিতে জনগণকে পূর্ববাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সংগঠিত করতে সক্ষম হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আওয়ামী লীগের দলীয় দাবি না হলেও শেখ মুজিবের একক প্রয়াসে প্রণীত বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ৬ দফা, মাওলানা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি চমকপ্রদ ও গ্রহণযোগ্য মনে হলো ভাসানী ও ন্যাপের ১৪ দফার চেয়েও। জনমত সুসংহত হলো সামরিক শাসনের বিরূদ্ধে ঘৃণায় এবং বাঙালির প্রাণের দাবী হয়ে উঠল ৬ দফা। এমন অকল্পনীয় জনপ্রিয়তার জোরে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ড় নিল। অন্যদিকে সামরিক জান্ড়া এবং পাকিস্ড়ানি রাজনীতির ক্ষমতাধর পাঞ্জাবী ক্লিক (গোষ্ঠী) ভেবেছিল, শেখ মুজিবের ৬ দফাকে জনগণ গ্রহণ করবে না এবং নির্বাচনে সামরিক জান্ড়া প্রভাবিত রাজনৈতিকদল বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্ড়ান পিপল্স্ পার্টি (পিপিপি) বিজয়ী হবে এবং সমরনায়কদের ক্ষমতার দম্ভ অটুট থাকবে। দেশব্যাপী গণমানুষের মনে ধূমায়িত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে যে একেবারে বিস্ফোরণোম্মুখ হয়ে আছে, তাও অনুধাবন করতে পারে নি পশ্চিমের কেউই।

১৯৭০ সালে গোটা পাকিস্ড়ানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সে নির্বাচনে পাকিস্ড়ান আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পেল পূর্ব পাকিস্ড়ানে। ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্ড়ানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও আওয়ামী লীগই উভয় পাকিস্ড়ান মিলিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। ফলাফল দেখে ভড়কে গেল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। সামরিক জান্ড়া প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান অনানুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাও করলেনঃ You will be the next prime Minister of Pakistan. কিন্তু সামরিক প্রধান প্রাসাদ-রাজনীতির মহিমা বুঝতে পারেন নি, তাই রাজনীতির কুটিল চক্রে পড়ে অবশেষে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে বিপুল-বিজয়ী আওয়ামী লীগের দাবি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার রাজধানী ঢাকায় নতুন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডাকলেও জোনারেল ইয়াহিয়া ঐ পাঞ্জাবি ক্লিকের ক্রীড়নক হয়ে নিজ স্বার্থ হাসিলের চিন্ড়ায় ঢাকায় ডাকা জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলেন – বারুদে যেন স্ফুলিঙ্গ পড়ল। ঢাকা নয় কেবল, এই ন্যাক্কারজনক ঘোষণা বাতাসের কানে-কানে দেশময় ছড়িয়ে গেল। পৌঁছে গেল বাংলার ঘরে-গৃহে, মাঠে-প্রান্ড়রে। অগ্নিগর্ভ হলো বাংলা। গর্জে উঠলেন প্রত্যেকটি মানুষ, বজ্রকণ্ঠে সোচ্চার হলেন সংঘবদ্ধ জনতা। উচ্চারিত হলো 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব'। তারপরের ইতিহাস অকুতোভয় বাংলার মানুষের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

সেদিন ছিল ১লা মার্চ ১৯৭১। ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য অর্থাৎ এম.এন.এ তাদের নিয়ে বৈঠকে ব্যস্ড় ছিলেন বাংলার

অবিসংবাদিত নেতা। ইয়াহিয়ার বেতার ঘোষণা শোনার পর বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল পৌঁছল সভাস্থলে। নেতা এলেন জনতার সামনে। ক্রোধে ফেটে পড়া মানুষগুলোকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে শেখ মুজিব জানিয়ে দিলেন, আজ থেকে অসহযোগ আন্দোলন চলবে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি তার সিদ্ধান্ড় জানাবেন।

প্রতিবাদে উত্তাল সারা বাংলা। জনগণের সচেতন গণআন্দোলন দমন-পীড়নে কিংবা গুলি করে মানুষ হত্যা করেও নিয়ন্ত্রণ করা গেলনা। ক্ষান্ড় হওয়া তো দূরের কথা, সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। স্কুলে-কলেজে মাঠে ময়দানে, কলে-কারখানায়, হাটে কি বাজারে মানুষের যেন ঢল নামলো। প্রতিবাদ নয়, এবার প্রতিরোধ আর প্রতিশোধ।

এলো ৭ই মার্চ ১৯৭১। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, রেসকোর্স ময়দানের বিশাল প্রান্ড়রে। তারপরও আসছে মিছিল চতুর্দিক থেকে, হাতে ফেস্টুন, স্ে াগান লেখা ব্যানার অগণিত। পথে পথে মিছিলেন প্রতিরোধ, সবাই মিলে জনতার ঐক্যকে যেন গড়ে তুলেছে। ক্রমশ রেসকোর্সের বিস্ড়ীর্ণ প্রান্ড়র নিমিষে জনসমুদ্রে পরিণত হলো। সামরিক জান্ড়ার দেয়া কপট নির্বাচনেও বিজয়ী জননেতা 'পাকিস্ড়ানের ভাবী কর্ণধার' শেখ মুজিবুর রহমান এলেন জনতার মূহুর্মুহু স্ে াগানে। দাঁড়ালেন সেই মঞ্চে, সেখানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ভাষণে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার বিপুল ঐক্যকে নির্দেশ দিয়ে শেষ করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঊনিশ মিনিটের তেজোদৃপ্ত ভাষণে ঘরে ঘরে দূর্গ তোলার তাগিদ, পাড়ায়-মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করার আহ্বান, সর্বোপরি 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি...'' – এ সবেরই তো যোগফল দেশবাসী বঙ্গসন্ড়ান, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, পাহাড় আর সমতলের অর্ধশতাধিক আদিবাসী জাতিসত্তার প্রাণপন যুদ্ধের শপথ। পাকিস্ড়ান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের পাঁজরের হাড় দিয়ে গড়া তীক্ষ্ণ হাতিয়ারে রুখে দাঁড়ালো নৃশংস হার্মাদ পাকিস্ড়ান বাহিনীকে।

এইতো মুক্তিযুদ্ধ। সারা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অকুতোভয় অভিযাত্রার ফসল একাত্তরের রক্তোৎপল বাংলাদেশ। রক্ত সাগরের সিমন্ড়িনী বাংলা মুক্তির আনন্দে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন শত্রু বধের উৎসবে। লাখো শহীদের রক্তোধোয়া এই বাংলার মুক্তিযুদ্ধ তাই সংকল্পের দৃঢ়তায় মাত্র ন'মাসে অভূতপূর্ব বিজয়ের সম্মানে ভূষিত করেছে মানুষের প্রাণবলিদান। এমন মহতী আত্মদানে সক্রিয় হয়েছিলেন ছাত্র-যুবক, কৃষক-মজদুর, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক-চিত্রকর, প্রকৌশলী-চিকিৎসক। কে না যোগ দিয়েছিলেন এই জনযুদ্ধে!

শোষণ-নিপীড়নের পাকিস্ড়ানি দুঃশাসনের তেইশ বছরে এই বাংলায় স্বাদেশিকতা এবং দেশপ্রেমের যে প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবং পশ্চিমা জোতদার-জমিদারদের

মুসলিম লীগ সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতি-বৈষম্য ন্যাক্কারজনকভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার ফলে পুর্ব বাংলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় আবিষ্ট পূর্ব ও পশ্চিমের সামন্তবাদী চক্র নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মানুষের সত্যিকার অধিকার রক্ষায় ব্যর্থই নয়, সেক্ষেত্রে নিপীড়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। মুসলিম লীগ, সামরিক জান্তা এবং সামন্তপ্রভু প্রভাবিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দমন-পীড়ন দেশবাসী জনগণ বিশেষ করে পূর্ববাংলার সচেতন জনগোষ্ঠীকে সহ্য করতে পারছিল না।

মুসলিম লীগ সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজ কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্তে উন্মাদ হয়ে উঠলে, লড়াই বাধে জনগণের সাথে। সেই সাথে বিরোধী জনগণের রাজনীতির পত্তন হয় এই বাংলায়ও। মুসলিম লীগশাহীর বিরুদ্ধে সংসদীয় রাজনীতির প্রথম দল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলো ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন। আসাম থেকে বহিস্কৃত 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন বিরোধী আসাম মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হলেন। মওলানা শামসুল হক সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। লীগশাহীর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে কথা বলার মতোন সংগঠন যখন দাঁড়াল, তখন সে সংগঠন জনসমর্থনে পুষ্ট হয়ে ছড়িয়ে গেল সারা পূর্ব বাংলায়। এখানে উলে খ্য, সংগঠনের নামটিতে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন নবগঠিত নেতৃত্বও। তবে আওয়ামী শব্দটি বোধ হয় উভয় পাকিস্তানকে লক্ষ করে ও জনসমর্থনের জন্য রাখা হয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ। যাই হোক এখান থেকেই মুসলিম লীগবিরোধী রাজনীতির সূচনা। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল, কিন্তু লীগশাহীর নিষেধাজ্ঞা ও খড়গ-কৃপাণ ঝুলছিল তাদের উপর। ফলে প্রকাশ্যে তাদের কোন কার্যক্রম লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না। যা কিছু করতেন সবই ছিল গোপন। ফলে ঐ আওয়ামী মুসলিম লীগই ছিল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীলদের কর্মস্থল। তবে কমিউনিস্ট মতবাদে যারা বিশ্বাসী ছিলেন তারা আওয়ামী মুসলিম লীগের বাইরে থাকলেও পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল এবং ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ গঠন করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনাকে প্রথম থেকেই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এমনি করেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তাই একদিন লীগশাহীর বিরুদ্ধে সংগঠিত গণশক্তিতে পরিণত হলে ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি যে অভীষ্ট লক্ষ্য তৈরি করেছিল ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, ১৯৬২'র সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অকল্পনীয় ছাত্রবিক্ষোভ, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৭-এ মওলানা ভাসানীর গভর্নর হাউস ঘেরাও থেকে উৎসারিত জনগণের শক্তির বিস্ফোরণ ঘটলো

১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল ও নিরঙ্কুশ বিজয় পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ জনগণকে মুক্তির নির্দেশিত পথেই এনে দাঁড় করিয়ে দিল। স্বতঃস্ফূর্ত গণশক্তির বিশাল-ব্যাপক উত্থান মুসলিম লীগ ও সামরিক জান্তার যূথবদ্ধ কপট রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশমুক্তির সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ১৯৭১-এ, পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে। জনতার বিপুল ঐক্যে, প্রবল শক্তি ও সাহসে প্রাণপণ যুদ্ধে পাকিস্তানি হার্মাদ বাহিনীকে পরাজিত করে মাতৃভূমিকে পরাধীনতা আর শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি এনে দিলেন। এই দীর্ঘ সংগ্রামের সাহসী পথ পরিক্রমায় সাংবাদিকতার অবদান ছিল অসামান্য, গণতান্ত্রিক রাজনীতির সম্পূরক।

সেই সময়ের সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা তখন ছিল অ্যান্টি এস্টাবলিসমেন্ট (Anti Establishment) এবং সত্যিকার অর্থেই সমাজ-সংস্কৃতির দর্পণ। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সরকারি টেলিফোনে নির্দেশ কিংবা প্রেসনোট জারি, সাংবাদিক গ্রেফতার, মানহানির মামলা, পত্রিকার জামানত তলব, সর্বোপরি পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল ইত্যাদি তৎপরতা সরকারের দিক থেকে ছিল। তাই সাংবাদিকদের পেশা ও ব্যক্তি মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিত্যই লড়াই করতে হয়েছে। আর সে কারণেই পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী সাংবাদিক সমাজের অভিভাবকত্ব, পেশাগত স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ দেশের সাংবাদিকদের একমাত্র সংগঠন 'পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন' ছিল প্রবল শক্তিশালী এবং সার্বজনীন জনপ্রিয় সংগঠন। একইভাবে সংবাদপত্রের সে সময়ের সম্পাদকদেরও একটি সংগঠন ছিল – 'অল পাকিস্তান নিউজপেপার এডিটারস কাউন্সিল' আর মালিকদের 'অল পাকিস্তান নিউজ পেপার সোসাইটি'। এদের মধ্যে সাংবাদিক ইউনিয়ন ও এডিটরস কাউন্সিলের মধ্যে পেশাগত সখ্য ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষের স্বার্থ দেখার মতোন নৈতিক বা পেশাভিত্তিক কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ তখন নিয়োগ পদ্ধতির প্রচলন সর্বত্র ছিলনা, বেতন এত কম ছিল যে, আজ তা কল্পনা করাও কঠিন। এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাংবাদিক সমাজকে মালিকের বৈরী আচরণ সহ্য করতে হয়েছে। এ আচরণের বিরুদ্ধে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' মারতে ছিল প্রস্তুত। সরকার ও মালিকের সখ্যর বরাতে বেতনকাঠামো প্রবর্তনে তাদের ছিল চরম অনীহা। তাই সাংবাদিক সমাজ অনশনের মতো কঠিন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে অদ্ভূত ঘটনা হলো, পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন জারি হলো, জেনারেল আইয়ুব খান 'জনপ্রিয়' হবার কৌশল হিসেবে 'সাংবাদিক বেতন বোর্ড' গঠন করলেন। কিন্তু সামরিক শাসক মাটিতে

পা রেখে এগুবার ভঙ্গি করলেও, পাশাপাশি ঠিকই 'প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' জারি করলো। এটিই পরে অ্যাক্ট হিসেবে জারি করার মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করলো। এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো মার্শাল ল জনসাধারণের আস্থা জয়ের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। তার পাশাপাশি খুব সন্তর্পণে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারেও তৎপর ছিল। সামরিক জান্তা 'গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালা'র মতলব এঁটে ভেবেছিল সাধারণ মানুষ তাদের কার্যকলাপকে 'আশীর্বাদ' হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু না, দেশবাসী সামরিক শাসকদের কৌশল বুঝতে পারলো। ক্রমশ অসন্তোষ জমা হতে থাকলো। এই অসন্তোষকে দমন করার জন্য 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' বাধিয়ে জনগণকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালাল সরকার। কিন্তু 'বিধি বাম'। জনসাধারণ তাদের মতলব ধরে ফেললো এবং রুখে দাঁড়ালো। কিন্তু ঐ 'মৌলিক গণতন্ত্রী' এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নির্বাচনের কারচুপিতে শাসকরা। স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের সমর্থন ছিল সম্মিলিত বিরোধী দলের (Combined opposition Partis, COP) প্রতি। কপের প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্না পরাজিত হলেন এবং আইয়ুব খান দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন কারসাজির মাধ্যমে। সারাদেশের মানুষ, বিশেষ করে সামরিক শাসন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীসংগঠক ও সমর্থকেরা হতাশ হলেন।

তেইশ বছরের কপট রাজনীতি ক্রূর মিথ্যাচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ, পাকিস্তানের সামরিক জোটে প্রবেশ, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতা এবং কবিগুরুকে বিসর্জন দেয়ার ধৃষ্টতাপূর্ণ চক্রান্তের বিপরীতে দেশবাসী একত্রিত ও যূথবদ্ধ হলো। আর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক আক্রমণ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন গোটা পাকিস্তানের সাংবাদিক সমাজ। আর তাদের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে ছিলেন পত্রিকা সম্পাদকবৃন্দ। সাংবাদিকদের এই দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সংগ্রামে পূর্ব বাংলার কয়েকজন সম্পাদক – *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার শ্রদ্ধেয় আব্দুস সালাম, দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা এবং দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকার জহুর হোসেন চৌধুরী – এঁরা ছিলেন সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাহস। সামরিক জান্তা প্রধান ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান পর্যন্ত এই 'ত্রয়ী'কে সমীহ করতেন। সত্যিকথা বলতে কি ভয়ই পেতেন। এঁদের যে সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল, সেই বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ, সাংবাদিকতা জগতে এ অবিস্মরণীয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার উদাহরণ দেয়াই যেতে পারে। এক. সামরিক জান্তা প্রধান আইয়ুব খান যখন মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হলো। গোটা জাতির সামনে পথনির্দেশক হিসেবে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত হলো কবি, সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফর লিখিত 'জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবে' শিরোনামে একটি কবিতা। সেটাই আমাদের দেখালো পথ।

গণশিল্পী-সুরকার শেখ লুৎফর রহমানের সুরসংযোজনে গানটি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে পরিবেশিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের বৃন্দগান হিসেবে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে সাড়া জাগাল গানটি। হতাশ কর্মীরাও সংগঠিত হতে শুরু করলেন। কিন্তু আইয়ুবশাহী এবার সংঘবদ্ধ জনগণকে বিভক্ত করার ক্রূর কৌশল হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সচেতন গণতান্ত্রিক সকল মানুষের ঘৃণার উদগীরণ ঘটলো প্রতি পদক্ষেপে। পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ গড়ে উঠলো, সৃষ্টি হতে থাকলো জনতার পূর্ণ ঐক্য। কেঁপে উঠলো সামরিক শাসনের তখ্‌তে তাউস। তাই দমননীতির স্টিম রোলার চললো রাজনীতিতে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা ও নিন্দাবাদের সাথে যুক্ত হলো। তাঁরাও ছায়ানটসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিরোধে রাজপথ দখল করে সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দাঁড়াবার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। ঐতিহাসিক এক ঘটনার জন্ম দিলেন সাহসে প্রত্যয়ী জাতির বিবেক সম্পাদক চতুষ্টয় – আব্দুল সালাম, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও জহুর হোসেন চৌধুরীর সাথে দৈনিক *আজাদ*-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এঁরা চারজন একই শিরোনাম 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও' ব্যবহার করে *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*, *আজাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার*-এ প্রথম পৃষ্ঠার ডাবল কলামে সম্পাদকীয় ছাপলেন। এই সম্পাদকীয় প্রকাশে জনমনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং সংগঠিত জনগোষ্ঠী ও প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক কর্মীবাহিনী সাহসে-প্রত্যয়ে আরো দৃঢ় মনোবলে শক্তিধর হয়ে দারুণ উদ্যমে ঘৃণ্য অপশক্তিকে প্রতিরোধের সংগ্রামে নিজেদের নিবেদন করলো।

সামরিক জান্তা যখন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে দমন করতে ব্যর্থ হলো বারবার, তখন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার মতলব আঁটলো তারা। জারি করলো ১৯৬৩ সালের 'প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেন্স অর্ডিন্যান্স'। সারা পাকিস্তানের সাংবাদিক সমাজ পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল আন্দোলনে নামলো এবং সংবাদপত্রে ধর্মঘট ঘোষণা করা হলো। এই ধর্মঘট মোট ১৭ দিন চলেছিল। ফলে ইংরেজি *ডন*, উর্দু *জঙ্গ*, পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক পাকিস্তান*সহ সকল পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রেখেছিল। এই সময় অবশ্য জামাতে ইসলামীর পত্রিকা দৈনিক *সংগ্রাম* র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের অফিসে গোপনে পত্রিকা ছাপাবার ব্যবস্থা নিয়ে কাগজও ছেপেছিল। খবর পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের দুই যুগ্ম-সম্পাদক আতাউস সামাদ এবং আমি (কামাল লোহানী) ছুটে গিয়েছিলাম সংগ্রাম অফিস। আমরা ছাপা কাগজগুলো সামাদের গাড়িতে উঠিয়ে ঢাকা নিউ মার্কেটের পূব পাশের বিশালাকার ড্রেনের ময়লা জলে ফেলে দিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, এই সাংবাদিক ধর্মঘটে বেতার সাংবাদিকরাও (এঁরা ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন না)

সংহতি কেবল প্রকাশ করেননি, সমাবেশে-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বক্তৃতা পর্যন্ড় করেছেন। এই প্রতিবাদী ঘর্মঘট আরো স্মরণীয় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো, যখন পাকিস্ড়ান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবানে পূর্ব পাকিস্ড়ান সাংবাদিক প্রতিবাদী শোভাযাত্রার ঘোষণা দিয়েছিল এবং সেই মিছিলের পুরোভাবে ছিলেন নবতীপরবৃদ্ধ মালিক-সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ। যদিও তিনি এবিএম মূসার চলমান ওপেনহুড গাড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ আব্দুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং জহুর হোসেন চৌধুরী মিছিলের অগ্রভাগে পদব্রজে চলছিলেন। এ ছিল তৎকালীন পাকিস্ড়ানি সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা। তৎকালের পূর্ব পাকিস্ড়ান সাংবাদিককূলের এই মহতী আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা চলমান রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলায় পূর্ব পাকিস্ড়ান সাংবাদিক ইউনিয়ন যে সাহসী এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও জনসাধারণের সমর্থনও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এমনকি সাধারণ সদস্যদেরও বহমান সংগ্রামে অংশগ্রহণের কারণে জেল-জুলুম ও সহ্য করতে হয়েছে। এই দমন-পীড়ন ছিল পাকিস্ড়ানের উভয় অংশেই। কারণ তখন সাংবাদিক সমাজের সচেতনতা এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের সরকারবিরোধী যৌক্তিক বিরোধিতা জনসাধারণ্যেও বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বহুজনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়ছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ইন্টারোগেশনের নামে নিপীড়ন করাও হয়েছে। তবুও সাংবাদিক সমাজের ঐক্য সামগ্রিক রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দারুণভাবে সহায়তা দিয়েছে। দেশের যেকোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনে সাংবাদিকদের দলমত নির্বিশেষে অংশগ্রহণই কেবল নয়, তাঁদের রিপোর্টিং-এর বস্তুনিষ্ঠতা ও সাহসী লেখনী রাজনৈতিক সংগ্রামকে বেগবান করতে ও জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

সাংবাদিক ইউনিয়ন যে প্রবল সাহস, ঐক্য এবং জনগণের সমর্থনে সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিল – তার প্রকৃষ্ট এবং সাহসী দৃষ্টান্ড় হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন। সমর্থনই নয় কেবল, সে সময় পূর্ব পাকিস্ড়ান সাংবাদিক ইউনিয়ন পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ, হত্যা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করে সেনাবাহিনীর কোনও সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশন না করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেছিল। এতে পশ্চিম পাকিস্ড়ানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান তার জনসংযোগ অফিসারকে পূর্ব বাংলায় পাঠিয়ে সাংবাদিক ইউনিয়নের সেনাবাহিনীর সংবাদ বয়কট করার সিদ্ধান্ড় প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা চালান। কারণ ঐ জনসংযোগ অফিসার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছিলেন এবং

সাংবাদিকতায় তাঁর বন্ধু ছিলেন কেউ কেউ। তিনি ঢাকা এসে সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে বসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ব্যক্তি পর্যায়ে তাঁরই এক সহপাঠী সাংবদিকের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্ড়ান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের সাথে প্রেসক্লাবে বৈঠকে মিলিত হন এবং অনুরোধ জানান ঐ সেনাবাহিনীর সংবাদ পরিবেশন না করার সিদ্ধান্ড়প্রত্যাহার করতে। কিন্তু ইউনিয়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ড় এবং সাধারণ সম্পাদকের দৃঢ়তার কারণে বরফ গলাতে তিনি ব্যর্থ হন। এ ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১ সালের মার্চের চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে, যখন পাকিস্ড়ানের প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসকগোষ্ঠীর দেয়া দেশের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সংলাপের 'নাটক' করছিলেন। এই সংলাপের ছদ্মাবরণে পশ্চিম পাকিস্ড়ান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছবার অপেক্ষায় ছিল। পাকিস্ড়ানি 'সোয়াত' ও 'বাবর' জাহাজ দু'টি পৌঁছল ইপ্সিত রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে এবং ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সেই জাহাজ খালাস করতে দায়িত্ব নেন মেজর জিয়াউর রহমান। কিন্তু তিনি বন্দর শ্রমিকদের ব্যারিকেডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যারিকেড অপসারণে যখন ব্যস্ড়, তখন খবর পান ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তুলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বাঙালি সেনাদের ডিসআর্ম করা হচ্ছে। তখনই মেজর জিয়া সেখান থেকে সরে পটিয়ায় পৌঁছান সীমান্ড় পাড়ি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁকে আটকে দেন। ফলে সেখানেই তিনি থাকতে বাধ্য হন।

যাহোক, সাংবাদিকরা দেশের এই চরম অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে যে ভূমিকা পালন করে মুক্তিকামী বাংলার মানুষের মনোবাসনা চিত্রায়িত করে সংবাদ পরিবেশন করেছেন, সম্পাদকীয় লিখেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। অথবা বলতেই পারি, সাংবাদিকরা মুক্তিসংগ্রামী জনগণের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে কারণেই পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনী অপরেশন সার্চলাইট-এর মাধ্যমে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল তার মধ্যে ছিল সংবাদপত্র বন্ধ করা, প্রেসক্লাবে মর্টার হামলা করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে *সংবাদ, ইত্তেফাক, ডেইলী পিপলস* ধ্বংস করা। সে সময়ে অন্যান্য আরও কাগজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পরে যখন তারা বুঝতে পেরেছিল, পত্রিকা বন্ধ থাকলে বহির্বিশ্বে তার প্রতিক্রিয়া বিরূপ হবে, তখন সেনা কর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করেছিল সংবাদপত্র প্রকাশের। কিন্তু টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, ডাকবিভাগের কর্মকা ে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এঅবস্থায় কাগজ বের করা অসম্ভব ছিল। অথচ সামরিক শাসকদের চাপের মুখে পত্রিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেও সাংবাদিকরা কৌশলে যে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল প্রচ ে সাহসী এবং অবশ্যই অভিনন্দনীয় ও বৈপ বিক। সাংবাদিকদের পক্ষে যখন কোনো খবর সংগ্রহ করা

অসম্ভব, টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোনও নেই, তাহলে পত্রিকা কী করে ছাপা হবে? তখন সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করা হয়, পুরনো নিউজের কাটিং, ছবি এবং ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন যা আগে ছাপা হয়েছে, সেলোফিন কেটে পেস্টিং এর মাধ্যমে পেজ মেকাপ করে তাই ছাপানো হবে। হয়েছিলও তাই, কয়েক দিন। ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ধরতেও পারেনি। কারণ বাঙালিরাতো সকলেই তখন ওদের বিরোধিতা করছিলেন। এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে যাঁরা সেদিন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজ। এঁদের মধ্যে এবিএম মূসা, সিরাজউদ্দিন হোসেন, কেজি মোস্ড়ফা, আতাউস সামাদ, আনম গোলাম মোস্ড়ফা-এর নাম উলে খ করতেই হবে।

সাংবাদিক সমাজ ও ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকার করণেই প্রেসক্লাবে মর্টার হামলা হয় এবং প্রখ্যাত লেখক-সংগঠক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিজন ফয়েজ আহমদ সেই হামলায় আহত হয়েছিলেন। কারণ তিনি*স্বরাজ* নামে যে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন, তার লেখা ও রিপোর্টিং ছিল আকর্ষণীয় এবং তার সম্পাদনা-রীতি ছিল তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার।

পাকিস্ড়ানি দুঃশাসনের তেইশ বছরে সংবাদপত্র জগতের যে মানুষগুলো দেশকে ভালবেসে পেশাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সাংবাদিকতা করতেন সত্যের পথে থেকে; জনগণের অধিকার আদায়ে যাঁরা ছিলেন সোচ্চার, তাঁদের মধ্যে সেনাবাহিনীর হন্ড়রকদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সিরাজউদ্দিন হোসেন, এম.এ. মান্নান (লাডু ভাই), আনম গোলাম মোস্ড়ফা, নিজামউদ্দিন আহমদ, হাবিবুল বাশার – এমন আরো অনেক সাংবাদিক। তাঁদের আজ স্মরণ করছি এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

পৃথিবীর যেকোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিপ বী বেতার কেন্দ্রের কথা আমরা পড়েছি। জেনেছি জনগণের শত্রহনন এবং যুদ্ধবিজয়ের সংবাদগাঁথাই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলা, সংগঠিত হবার অনুপ্রেরণা দেয়া এবং সংঘবদ্ধ গণশক্তির অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নাগরিক-বিজয় অর্জন করা – এ বিদ্রোহী বেতারেরই অবদান। তাই প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রমুক্ত করতে সাংবাদিকতার ধারাবাহিক অভিযাত্রার পর চরম মুহূর্তে জরুরি এই বেতার ব্যবস্থাপনা। বিপ ব বা বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধ তথা জনযুদ্ধের দৈনন্দিন খবর সংগ্রহ ও প্রচার দেশবাসী সকল পরপদানত মানুষের মনোবলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলে এবং এদেশেও তাই হয়েছিল। মুক্তিসেনাদের দৈনন্দিন বিজয়সংবাদ দিতে, মুক্তিকামী এমনকি অবরুদ্ধ মানুষের মনোবলকে প্রবলশক্তিতে বলবান করতে এবং রণাঙ্গনে কিংবা বাঙ্কারে বাঙ্কারে যুদ্ধরত মুক্তিসেনাদের উদ্দীপ্ত করে বিজয় অভিযান ও শত্রহননকে নিরন্ড়র জারি রাখতে অপরিহার্য এই প্রচারমাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের

উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধকালীন মরণজয়ী মনোবল জাগ্রত রাখা এবং মুক্তিকামী মানুষের জাগরী চরিত্রকে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত রাখা।

মুক্তিকামী জনগণের যুদ্ধজয়ের অবশ্যম্ভাবী হাতিয়ার হিসেবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ বী বেতার কেন্দ্র' প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরু হবার পর। চট্টগাম বেতারে ২৬শে মার্চ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এটি। কিন্তু সিনিয়র একজন বেতার কর্মকর্তা আব্দুর কাহহার চৌধুরী উদ্যোগী বেলাল মোহাম্মদদের বলেছিলেন আপনারা কালুরঘাট বেতার প্রক্ষেপণ কেন্দ্রে চলে যান, জায়গাটা নিরাপদ। পরে সেখান থেকে বিপ বী বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রম শুরু করেন চট্টগ্রাম বেতার এবং শহরের সংস্কৃতি সংগ্রামে সম্পৃক্ত প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজন অপরিহার্য। বিশ্বের সকল মানুষ এমনকি মুক্তিসংগ্রামী জনগণকে নিত্যকার খবরা-খবর পরিবেশন করা এবং যুদ্ধরত সংগ্রামী যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত করা কিংবা বিপ বী সরকারের নির্দেশাবলী সময়-সময় জানানোর ক্ষেত্রে এই বেতারের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এটি সংগঠনে অশগ্রহণ করেন রাজনীতি সচেতন প্রাক্তন ছাত্র নেতা বর্তমানে বেতারকর্মী এবং চট্টগ্রাম শহরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অন্দোলনের সংগঠকেরা। তাঁরা যেহেতু দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাই বিলম্ব করেন নি, গণহত্যা শুরু হবার সাথে-সাথেই বুঝতে পেরেছিলেন, এখনই বিপ বী বেতার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই দায়িত্বপূর্ণ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করে ঐতিহাসিক প্রয়াসে স্বাধীন বাংলা বিপ বী বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেন তারা। পাকিস্ড়ানি হামলার আগ পর্যন্ড় বিপ বী বেতার কালুরঘাটেই ছিল। পরে তাঁরা অসম সাহসিকতা ও অকল্পনীয় দক্ষতায় ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি উঠিয়ে সীমান্ড় পেরিয়ে যান এবং প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বগাফার জঙ্গলে বিএসএফ-এর সহযোগিতায় ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন। সেও এক অনন্য দৃষ্টান্ড়। সে কাজের যে অভিজ্ঞতা ও বাস্ড়ব পরিবেশ, আজ তা চিন্ড়া করা দুস্কর।

এদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমদ তরুণ ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামকে নিয়ে ভারতে সসম্মানে প্রবেশ করলেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বিএসএফের সর্বভারতীয় প্রধান রুস্ড়মজীর মাধ্যমে। পরিশ্চমবঙ্গের বিএসএফ প্রধান গোলক মজুমদারের যোগাযোগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক একাজটি সম্পন্ন হয়েছিল।

যাহোক তাজউদ্দিন-আমীরুল, ইন্দিরাজীর সাথে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে যে সহায়তা চেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বেতার সম্প্রচার যন্ত্র। সেইমতো ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মধ্যম তরঙ্গের একটি ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করেছিল। তাই নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মে বিদ্রোহী কবি কাজী

নজরুল ইসলামের জন্মদিনে কলকাতার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে 'স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপিত হলো। এই প্রথম সরকার পরিচালিত প্রচারকেন্দ্রে পরিণত হলো সেটা। তবে কালুরঘাটের ধারাবাহিকতায় এর নামকরণ একই রাখা হলো। এখানে স্মরণযোগ্য, চট্টগ্রামে প্রথমে যখন বেতার চালু করা হয় তখন তার নামকরণ হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বিপ বী বেতার কেন্দ্র'। কিন্তু যখন মেজর জিয়াকে পটিয়া থেকে অনেক বুঝিয়ে নিয়ে আসা হলো তখন তাকে বেতারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি বলতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু পূর্বশর্ত হিসেবে 'বিপ বী' শব্দটি বাদ দিতে বলেন। বিপ বী বেতারের উদ্যোক্তারা ভাবলেন বাঙালি সেনাদের সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য মেজর জিয়াকে প্রয়োজন। তখন উদ্যোক্তারা 'বিপ বী' শব্দটি পরিহার করে নিয়েছিলেন। মেজর জিয়া এই পরিস্থিতিকে 'সামরিক অভ্যুত্থান' ভেবে নিজেকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করে বেতারে প্রচার করেন। কিন্তু এটা যে সামরিক অভ্যুত্থান নয়, রাজনৈতিক যুদ্ধ, সেটা তাঁকে বিভিন্নজন বোঝানোর পর তিনি খুবই দ্বিধান্বিতচিত্তে কী বলবেন তা ভাবতে থাকেন। অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন ২৭শে মার্চ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হলেও ট্রান্সমিটারটি ছিল সীমান্তের কাছাকাছি নিরাপদ কোনো একটি স্থানে, যার কথা নিরাপত্তার কারণে আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। এই শক্তিশালী বেতারযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ এর মাধ্যমে কেবল মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর কেন, শত্রুনিধনে আমাদের সফলতা ও শত্রুর ব্যর্থতা প্রচার, মুক্তিসেনাদের তৎপরতা জানানো এবং তাঁদের অনুপ্রাণিত করা, দেশের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ বাংলার তাবৎ মানুষের মনোবল অটুট রাখা ও তাঁদের সাহস দেয়া যেমন কর্তব্য ছিল তেমনি বিদেশে সকল সহায়ক রাষ্ট্র-জনগোষ্ঠীকে নিজেদের কথা জানানোর জন্য বেতারই ছিল অন্যতম প্রধান মাধ্যম। শুধু কি তাই? অবাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'পাকিস্তান' ভাঙ্গা হচ্ছে বলে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তার বিরুদ্ধে সত্যটাকে তুলে ধরার দায়িত্বও এই বেতার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে নিজ শক্তি এবং মেধায় পরিচালিত হয়েছে। ভারত আমাদের ট্রান্সমিটার ও একটি রেকর্ডিং মেশিন দিয়েছিল, তা দিয়েই শুরু। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট বেতারের কর্মী-শিল্পী-কলাকুশলীরা এটি পরিচালনা করতেন। এছাড়া দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ সাংবাদিক ও শিক্ষক-শিক্ষাবিদ তথা লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের গান ও কথিকা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, চরমপত্র, জল াদের দরবার, অগ্নিশিখা, পিন্ডির প্রলাপ, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিসহ নানা বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো। এতে অভিজ্ঞ সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, আব্দুল তোয়াব খান, মোহাম্মদউল াহ চৌধুরী, আব্দুল

গাফফার চৌধুরী, এমআর আখতার মুকুল, কামাল লোহানী, রণজিৎ পাল চৌধুরী, সলিমুল া, সাদেকীন, আমীর হোসেন প্রমুখ প্রধানত বিশে ষণাত্মক প্রচারধর্মী কথিকা লিখতেন এবং সেগুলো প্রচারিত হতো। বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান, গাজীউল হক, জহির রায়হান, আনিসুজ্জামান, এআর মলি ক ছিলেন এবং রাজনৈতিক নেতা ও সংসদ সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেছেন এই বেতারে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ বিভাগ ছিল সবচে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই মুক্তিসেনাদের সফলতা, শত্রুর পরাজয় জণগণকে সাহস দেয়া আর মুক্তিসেনাদের মনোবল দৃঢ় রাখার নানা উপাদান প্রচারিত হতো। সংবাদ বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম আমি (কামাল লোহানী)। সহকর্মী শব্দসৈনিক হিসেবে ছিলেন জালাল উদ্দিন আহমদ, মৃণালকৃষ্ণ সেন, রণজিৎ পাল চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া, ম. মামুন, আলমগীর কবির, আলী যাকের, পারভীন হোসেন, নাসরিন আহমদ (শীমু), সৈয়দ হাসান ইমাম, আলী রেজা চৌধুরী, নূরুল ইসলাম সরকার, বাবুল আখতার। এঁরা নিয়মিত বাংলা ও ইংরেজি বুলেটিন তৈরি করতেন ও পাঠ করতেন। এমনকি কথিকা, জীবতিকাতেও তারা অংশ নিতেন। আমরা পরের দিকে ময়মনসিংহের জাহিদ সিদ্দিকীকে পেলাম যখন তখন থেকে উর্দু সার্ভিস চালু করলাম। কারণ জাহিদ উর্দুভাষায় পারদর্শীই নন, পন্ডিত ছিলেন। তাঁকে পারভীন হোসেন ও আমি সহযোগিতা করেছি। নিয়মিত সংবাদ পাঠকদের বাইরে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আব্দুল াহ আল ফারুক (ইংরেজি), শাহজাহান ফারুক এমনকি আমিও ইংরেজি ও বাংলা সংবাদ পাঠ করতাম। তবে কলকাতা থেকে যখন সরকারের তত্ত্বধানে স্বাধীন বাংলা বেতার সম্প্রচার শুরু হয় তখন এর দায়িত্বে ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান (তিনি আহমদ রফিক নামধারণ করে *জয়বাংলা* সাপ্তাহিক সম্পাদনা ও প্রাশ করতেন)। তাঁর সাথী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা জিল ুর রহমান ও মোহাম্মদ খালেদ (সংসদ সদ্য ও দৈনিক *আজাদী*র সম্পাদক) এরা প্রতিদিন বিকেলে বেতারে আসতেন এবং পরামর্শ করতেন ও আমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানতেন। ব্যবস্থা নিতেন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে।

এই রেকর্ডিং-এর কাজ শেষ হলে স্পুল টেপগুলো সযতনে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগে করে তৈরি রাখা হতো। বিএসএফ-এর নির্দিষ্ট ব্যক্তি এসে এগুলো নিয়ে একটি জিপে করে ছুটতেন ৪৫ মাইল গতিতে। ট্রান্সমিটারে পৌঁছতে লাগত প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপর নির্ধারিত সকাল, দুপুর ও রাতের অধিবেশন শুরু হতো। প্রথমে আমাদের একটি রেকর্ডিং স্টুডিও থাকলেও পরে আরো একটি হয়েছিল। তবে স্টুডিও না বলে একে কক্ষ বলাই ভাল। স্টুডিওর কোনো চরিত্রই এর ছিলনা; থাকবার কথাও নয়। কারণ যুদ্ধাবস্থায় ও ধরনের যন্ত্রপাতি কেনা ও বহন করা দুস্কর।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যখন কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার শুরু হলো, প্রথমদিকে আমাদের হারমোনিয়াম বা তবলা কিছুই ছিল না। রেকর্ডের গানগুলো প্রচার করতে করতে ঐসব যন্ত্র ক্রমশ সংগ্রহ করা হলো। শিল্পীরাও এসে পৌঁছলেন। কিন্তু কলকাতার বীমা কোম্পানীর এক কর্মচারী, আমাদের বন্ধু গোবিন্দ হালদারের কাছে আমরা যা পেলাম, তার জন্য পুরো দেশই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। যখন নতুন গানের সংকট তখনই গোবিন্দ আমাকে অনেকগুলো গান লিখে দিলেন। যার মধ্যে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'পূর্ব দিগন্ড়ে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল' – এই গানগুলো দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এছাড়া প্রয়োজনে, যারা কোনোদিন গান লেখেননি, তাঁরও রচনা করেছেন এবং বেতারে সে গান প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, বিজয়ের মূহূর্তে যখন পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটছে, তখনই প্রচারিত হলো বিশেষ সংবাদ বুলেটিন, যে বুলেটিনে জগদ্বাসী জানতে পারলেন, পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিজয়লাভ করেছে। আজ আমরা মুক্ত স্বাধীন। সংবাদটি আমিই রচনা করেছিলাম ও পাঠ করেছিলাম। এ আমার গর্ব। সেই সাথে আরেকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল, সে হলোঃ বিজয় মুহূর্তে গীতিকার-সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে লিখতে শুরু করলেন একটি গান! 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ...' গানটিতে সুরকার সুজেয় শ্যাম সুর বসাতে থাকলেন। এমনি করে গানটি তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড করে ঐ সংবাদ প্রচারের পরপরই বাজানো হয়। গানটির দু'লাইন করে লেখা হচ্ছে আর সুরকার সুর সংযোজন করছেন এবং শব্দসৈনিক গণশিল্পী অজিত রায়ের নেতৃত্বে কোরাসে গানটি রেকর্ড করা হচ্ছে। ঘটনাটি দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক অকল্পনীয় অধ্যায়।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিত সচেতন রাজনীতির কর্মী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রচার, দেশপ্রেমে উজ্জীবন এবং আত্মত্যাগে বলীয়ান মুক্তিসেনাদল যখন নিজেদের শাণিত অস্ত্রকে দুশমন-দস্যুদের বিরুদ্ধে তাক করে নিরন্ড়র এগিয়ে চলেছেন, সেই সময় একটি দলকে দেখা গেল, স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করার পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা কী হবে, তাই নিয়ে বিপ্লবী বেতারে ধর্মঘট করে বসলেন। কেউ কি শুনেছেন, বিপ বী বেতারে ধর্মঘটের কথা? না। শোনেন নি, কারণ এই মানুষগুলো মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে আসেন, জীবনকে উৎসর্গ করেন শত্রুকে বিতাড়িত করে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে, তাঁরা কেন যুদ্ধ বন্ধ করবেন পয়সার জন্যে? প্রবাসী সরকারইতো তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আরতো কোনো প্রয়োজন আমাদের ছিল না। আমাদের কাজ ছিল কেবলই বেতার পরিচালনা করা। দুঃখজনক হলেও অমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আমাদের তিনদিন পড়তে হয়েছিল। এ এক বিচিত্র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা মুক্তিযোদ্ধা শব্দসৈনিকদের জন্য। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা

বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের সকল যোদ্ধা অত্যন্ড় তৎপর ছিলেন, যেন কোনোভাবেই অবরুদ্ধ বাংলার মানুষের মনে না হয়, স্বাধীন বাংলা বেতার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সেদিন সাংবাদিক শব্দসৈনিকেরা নিজেদের কলম আরো তীক্ষ্ণ করেছিলেন, বেতার সম্প্রচার বন্ধ হতে দেননি। এজন্য আমাদের উপর ক্ষোভ ছিল ধর্মঘটী শিল্পী কর্মীদের।

এই সাংবাদিক শব্দসৈনিকেরা আরও এক দফা তাঁরা তাঁদের দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম) কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কর্মসূচি হিসেবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই একবার 'বন্‌ধ' ডাকলো, তাও ৭২ ঘণ্টার জন্য। নানাভাবে চেষ্টা করে সীমান্ড় নিকটবর্তী বেতার ট্রান্সমিশন ভবনে যেতে ভারতীয় নিরাপত্তা বিভাগের কোনো অনুমতি মিললো না। সংবাদ বিভাগকে বিপদে পড়তে হলো। আমরা চিন্ড়িত, কী করা যায়? গণসঙ্গীত, কথিকা, চরমপত্র, জল াদের দরবারতো রেকর্ড করা আছে, চালিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তিনদিনের মুক্তিযুদ্ধের খবর কীভাবে প্রচার করা যাবে দিনরাত। পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর হামলা প্রতিরোধ এবং নিজেদের পরিকল্পিত অভিযান সম্পর্কে যদি প্রত্যাহিক তাজা খবর না দেয়া যায়, তাহলেতো আর কারো কোনকিছু না হলেও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে এই ভেবে যে, স্বাধীনবাংলা বেতার বোধহয় বন্ধ, পাকিস্ড়ানিরা ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা ভাববে নিশ্চয়ই আমরা হেরে যাচ্ছি। আমাদের সকলেরই চিন্ড়া, এমন পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না ঘটে। তাহলে কী করা যায়? তখন আমরা মুক্তিসেনা সহযোদ্ধাবন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া একটি ছককে অবলম্বন করে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করলাম। ছকটি ছিল এমন, কোন অঞ্চলে কবে কেমন অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং তাতে কত শত্রু সেনার মৃত্যু এবং অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে, তারই আনুমানিক হিসেব। অগত্যা আমরা ভাবলাম, যদি যেতে নাই পারি তাহলে ঐ ছক অনুযায়ী হিসেব করে সংবাদ বুলেটিন রচনা করে প্রতিদিনের তিন অধিবেশনে বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু – মোট তিনটি করে ৯টি বুলেটিন অর্থাৎ তিন দিনের তিন অধিবেশনে ৩x৯=২৭টি বুলেটিন তৈরি করে দিতে হবে। সে এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেদিন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শব্দসৈনিকেরা সেদিন যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে তা ঘটনা হিসেবে অনন্য। স্বাধীন বাংলা বেতারের সম্প্রচারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই এটা করা হয়েছিল, অবরুদ্ধ বাংলার অমিততেজ লড়াকু মানুষগুলো যেন কোনো দুর্ভাবনায় না পড়েন এবং সাহস না হারান, সে জন্যও এটা করা হয়েছিল। মুক্তিসংগ্রামের প্রবল সাহসী এ উদ্যোগ – এর তুলনা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বিষয় সেদিন আমরা জানতাম, বেতার সম্প্রচার একদিনও বন্ধ রাখা যাবেনা। তাহলে মুক্তিসংগ্রামী প্রতিটি মানুষের মনে যে

প্রশ্নের সৃষ্টি হবে, তা কিন্তু মানুষকে হতাশাগ্রস্ড় করে ফেলবে – এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ অথচ রাজনীতি সচেতন বেতার ও সংস্কৃতিকর্মীরা কী করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তার আর একটি অনন্য দৃষ্টান্ড় উলে খ করতে চাই, আজকের এই মহতী আয়োজনে, কারণ এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সাহসী প্রয়াস, আমার মনে হয়, শত্র"র বিরূদ্ধে দেশকে ভালবেসেই সাধন করা সম্ভব। ঘটনাটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের। চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী-প্রকৌশলী, লেখক-সংগঠকরা পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর রোষানলে পড়ে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ড় হলেন কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবনে। তখন তাঁরা দিশেহারা। এই সময় মুক্তিযোদ্ধা বেতার কর্মী-সংগঠকেরা সিদ্ধান্ড় নিলেন, যেদিকেই যান না কেন তাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার জন্য ট্রান্সমিটার যন্ত্রটির প্রয়োজন হবেই। তখন পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর বোম্বিং-এ বিধ্বস্ড় কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবন থেকে এক কিলোওয়াট প্রক্ষেপণ শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রকৌশল বিভাগের কর্মী, যারা এই সময় সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এক কিলোওয়াট যন্ত্রটি তুলে নেবার ব্যবস্থার কথা ভাবলেন। যন্ত্রটি পরিবহণের জন্য মেজর জিয়াউর রহমান একটি ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই ট্রান্সমিটারটি উঠিয়ে সীমান্ড় পেরিয়ে চট্টগ্রামের শব্দসৈনিক বন্ধুদের একটি দল এটিকে নিয়ে প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার বগাফার জঙ্গলে বিএসএফের সহযোগিতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই ট্রান্সমিটারটি পুনঃস্থাপনে আরেক অনন্য ইতিহাস রচিত হলো। এই দলের সদস্য ছিলেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের টেকনিক্যাল অপারেটর তরুণ রাশেদুল হোসেন। দেশপ্রেম এবং মুক্তি প্রয়াসের প্রয়োজনে সেদিন রাশেদ সহযোদ্ধা শব্দসৈনিকদের সহায়তায় 'কপিবুক' ছাড়াই ট্রান্সমিটারটি রিইনস্টল (Reinstall) করে ফেললেন। এ ছিল অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। এ ছিল দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধার পবিত্রতম দায়িত্ব এবং প্রয়োজনের প্রতি আনুগত্য। সাবাস রাশেদ, তোমার জয় হয়েছে। আমরা লড়াইয়ে জয়ী হয়েছি। এতে তোমার ও সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তবে দুঃখ আজ বড্ড বেশি, ৪৪ বছর বয়ে যাবার পরও এই মহান কীর্তির নিপুণ কারিগর কোনো স্বীকৃতি তো পানই নি সবার অজান্ড়ে কঠিন অসুস্থতায় জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন। তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থেকে আমাদের দায়িত্ববোধে লজ্জার কলঙ্ক লেপন করেছেন। সেদিনের এই মহতী দায়িত্ব সম্পন্ন কী করে করলেন ঐ তরুণ, তা দেখে ভারতের তথ্য প্রতিমন্ত্রী নান্দনী সৎপতি এবং সর্বভারতীয় 'আকাশবাণী' প্রধান প্রকৌশলী থ' বনে গিয়েছিলেন। তাজ্জব ঘটনার নায়ককে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন,

'আমরা বিশ্বাস করি তোমরা জিতবেই।' চট্টগ্রামের সর্বশেষ যে দশজন এই মুক্তিসংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে, তাঁদের পাঁচজনকে ইতোমধ্যেই হারিয়েছি। বঙ্গবন্ধু তাঁদের সাহসী প্রয়াস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কর্তব্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। অথচ আজ প্রায় ৪৪ বছর হলো বঙ্গবন্ধুর সেই মহতী ইচ্ছাকে কেউ পূরণ করে নি।

উপসংহার

পাকিস্ড়ানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নিপীড়ন, সম্পদ অপহরণ এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি চরম অবজ্ঞা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য – সবকিছু মিলিয়ে মানুষকে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ করে করে তুলেছিল। তেইশ বছরের নিরন্ড়র দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে অব্যাহত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রে এদেশের মানুষ মাধ্যমে চরম আঘাত হেনেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাংবাদিক সমাজ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে, কলমযোদ্ধা কিংবা গোটা গণমাধ্যম শব্দসৈনিক হিসেবে যে অবিস্মরণীয় সাহসী ভূমিকা পালন করেছে এ তার সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র। কিন্তু তাঁদের এই অকুতোভয় সাহস সেদিন আন্দোলন-সংগ্রামে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল বলেই, সমস্ড় পৃথিবী জেনেছিল বাংলার মানুষের অমিততেজ অনুপ্রেরণার কথা – কণ্ঠে-কলমে যা বিধৃত হয়েছে। এ ছিল যুদ্ধ করে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'কে হায়েনার কবল থেকে পুনরুদ্ধারের কাহিনী।

আজ যে মহান ব্যক্তিত্ব, প্রবল সাহসী সম্পাদক-অভিভাবক, মুক্তসাংবাদিকতার অন্যতম পুরোধা আব্দুস সালামকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন, তাকে স্মরণ করছি। সাংবাদিক সমাজের দায়িত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রক্তআখরে যে নাম লিখে গেছেন তিনি, সেইতো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে শেষ করছি। কামনা করছি, যেন আমরা সবসময় তাঁদের প্রদর্শিত সাহসী পথে চলতে পারি।

স্মারক বক্তা

কামাল লোহানী

১৯৫৫ সালের জুলাই মাস। রাজশাহী কারাগার থেকে মুক্তির পর কামাল লোহানী ফিরে এলেন পাবনায়। কিন্তু অভিভাবকদের সাথে তাঁর শুরু হলো রাজনীতি নিয়ে মতবিরোধ। অভিভাবকদের কথা, "লেখাপড়া শেষে রাজনীতি করো, আপত্তি নেই"। কিন্তু কামাল লোহানী তখন রীতিমত রাজনীতিপ্রভাবিত এবং মার্কসবাদের অনুসারী, চোখে তাঁর বিপ্লবের ঐশ্বর্য। আর তাই তিনি ছোট চাচা শিক্ষাবিদ তাসাদ্দুক লোহানীর কাছ থেকে মাত্র ১৫ টাকা চেয়ে নিয়ে অনিশ্চিতের পথে ঢাকা অভিমুখে পা বাড়ালেন। জীবনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলেন। আর সেই সঙ্গে শুরু হল তাঁর জীবনসংগ্রাম।

ঢাকায় এসে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ফজলে লোহানীর সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে দৈনিক *মিল্লাত* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এভাবে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হলো তার। সেই থেকে তাঁর কলমের আঁচড়ে তৈরি হতে লাগলো এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কামাল লোহানী নামেই সমধিক পরিচিত হলেও পারিবারিক নাম তাঁর আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী। বাবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মুসা খান লোহানী, মা রোকেয়া খান লোহানী। তাঁদের বসতি ছিল যমুনা পাড়ে, খাস কাউলিয়ায়। আগ্রাসী যমুনা-গর্ভে তাঁদের বাড়িঘর জমি-জিরেত চলে যাওয়ার পর তাঁরা সিরাজগঞ্জেরই উল্লাপাড়া থানার খান সনতলা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আর এই খান সনতলা গ্রামেই ১৯৩৪ সালের ২৬ জুন, ১১ আষাঢ়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কামাল লোহানী জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র ৬-৭ বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। একান্নবর্তী পরিবারে বাস হওয়ায় বাবা তাঁকে গ্রামে না রেখে পাঠিয়ে দিলেন নিঃসন্তান ফুফু সালেমা খানমের কাছে, কলকাতায়। এখানে এসে তিনি বেড়ে উঠতে লাগলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক বিভীষিকাময় দুর্যোগের মধ্যে – কখনও ঘরে, কখনও-বা ট্রেঞ্চে।

দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে পাবনা চলে এলেন, পাবনা জিলা স্কুলে ভর্তি হলেন। ছোট কাকা শিক্ষবিদ ও লেখক তাসাদ্দুক হোসেন খান লোহানীর কাছে থাকেন তিনি।

১৯৫২ সাল ছিল তার মাধ্যমিক পরীক্ষার বছর। বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারির রক্ত ঢাকা থেকে ফিনকি দিয়ে যখন পাবনা পৌঁছল, তখন বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর আর দাঙ্গা দেখা তারুণ্যে উদ্দীপ্ত এই কিশোর ছুটে বেরিয়ে এলেন, কণ্ঠ উচ্চকিত করলেন মিছিলে, হত্যার প্রতিবাদে। রাজনীতিতে সবক নিলেন তিনি ঐ বায়ান্নর একুশ, বাইশ আর তেইশে ফেব্রুয়ারির রক্তধোয়া দিনগুলোর সংঘাতে।

১৯৫২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। এরপর ভর্তি হলেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। এই কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে আন্দোলনে যোগদান এবং বারবার কারাবরণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যখন কলেজ নির্বাচন এগিয়ে এলো, তখন তাঁরা কজন সমমনা একজোট হয়ে বাঁধলেন জোট, নাম দিলেন 'পাইওনিয়ার্স ফ্রন্ট' অর্থাৎ প্রগতিবাদী ছাত্র জোট। লড়লেন নির্বাচনে এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেন। এই ফ্রন্টের সদস্যরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর গড়ে ওঠা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন করতেন।

১৯৫৩ সালে পাবনার তৎকালীন জিন্নাহ্ পার্কে (বর্তমান স্টেডিয়াম) মুসলিম লীগ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষা আন্দোলনে ছাত্র হত্যাকারী নূরুল আমিনের পাবনা আগমন ও মুসলিম লীগ সম্মেলনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় কামাল লোহানী পাবনার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের সাথে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হলেন। ৭ দিন পাবনা জেলে আটক থেকে জামিনে মুক্তি পান। এছাড়া ১৯৫৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এবং ১ জুন দু'দফা গ্রেফতার হন তিনি।

১৯৫৫ সালে তিনি ন্যাপ-এ যোগ দেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। চাচাতো বোন সৈয়দা দীপ্তি রানীকে ১৯৬০ সালে বিয়ে করেন। দীপ্তি তখন সমাজল্যাণে মাস্টার্স করছিলেন। জীবিকার চাপ শুরু হলে, কামাল লোহানী বনেদী সংবাদপত্র দৈনিক *আজাদ*-এ যোগ দেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় শুরু হলো তোড়জোড়। কামাল লোহানী যুক্ত হলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সাংগঠনিক কাজে। এছাড়া ১৯৭০ সালে পণ্ডিত বারীণ মজুমদারের একক প্রচেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে আয়োজিত 'প্রথম পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন' এবং ১৯৭২ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সম্মেলন'-এ কামাল লোহানী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, শিল্পী সংগ্রহ, উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন দায়িত্বে সম্পৃক্ত থেকেছেন।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গর্জে উঠলো। কামাল লোহানীর নামে জারি হলো হুলিয়া। ১৩ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে দৈনিক *আজাদ* থেকে ঘরে ফেরার পথে গ্রেফতার হন তিনি।

এই সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ২৬ নম্বর সেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমেদ, রণেশ দাশগুপ্ত, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ অনেকেই একসাথে ছিলেন। এ সময় ছাত্রনেতা শাহ মোয়াজ্জেম, শেখ মনি, হায়দার আকবর খান রনো, শ্রমিক নেতা নাসিম আলীও ছিলেন। সাড়ে তিন মাস পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক *সংবাদ*-এ সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দিয়ে অল্প দিনেই শিফট-ইন-চার্জ পদে উন্নীত হন। ১৯৬৬ সালে 'পাকিস্ত্মান ফিচার সিন্ডিকেটে' এবং ১৯৬৯ এর প্রথম দিকে কিছুদিনের জন্যে দৈনিক *পয়গাম*-এ যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের শেষ ভাগে কামাল লোহানী *অবজারভার* গ্রম্নপ অব পাবলিকেশন্সের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় শিফট ইনচার্জ হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি চিফ সাব-এডিটর পদে উন্নীত হন। এই সময়কালে তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নে দু'দফায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্ত্মান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে স্বল্পকাল কারাবাসের পর কামাল লোহানী 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাড়ে চার বছর এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। নীতিগত কারণে ছায়ানট ছেড়ে মার্কসবাদী আদর্শে ১৯৬৭ সালে গড়ে তোলেন 'ক্রান্তি'। ১৯৬৭ সালের ২২ ও ২৩ ফেব্রম্নয়ারি ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্বোধন হয় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। ১৯৬৭ সালে যখন পাকিস্ত্মানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন পার্লামেন্টে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে খাটো করে বক্তব্য দেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে "তিনি আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির কেউ নন" উচ্চারণ করলে পূর্ব বাংলা ফুঁসে ওঠে। আপসহীন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠক কামাল লোহানী 'ক্রান্তি'র জরুরি সভা ডেকে প্রতিবাদ করলেন, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রেজুলেশন পাঠালেন। সেই রেজুলেশন থেকেই অত্যন্ত সাহসের সাথে সামরিক শাসনের মাঝেও ডেইলি *অবজারভার*-এর নিউজ এডিটর এ বি এম মূসা নিউজ করলেন 'Regimentation of Culture?'। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুরু হল যূথবদ্ধ আন্দোলন 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' নামে যার আহবায়ক হলেন ওয়াহিদুল হক ও কামাল লোহানী।

২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউনের পর অবস্থার অবনতিতে অবশেষে এপ্রিলের শেষে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কামাল লোহানী। ভারতে গিয়ে তিনি যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সাংবাদিক কামাল লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ বিভাগের দায়িত্ব নেন। তিনি সংবাদ বিভাগ সংগঠন করা ছাড়াও সংবাদ পাঠ, কথিকা লেখা ও প্রচার, ঘোষণা, স্লোগান দেয়া ইত্যাদিতে কণ্ঠ দিয়েছেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রথম বার্তাটি লিখেছিলেন তিনি এবং বিশ্ববাসীর কাছে সেই বিজয় বার্তা পৌঁছেছিল কামাল লোহানীর উচ্চারণে।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি দায়িত্ব নেন ঢাকা বেতারের। দায়িত্ব নেয়ার পর বিধ্বস্ত বেতারকে পুনর্গঠনে ব্রতী হন তিনি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন কামাল লোহানী এবং আশফাকুর রহমান খান।

দেশ স্বাধীন হলেও প্রশাসনে পরিবর্তন আসে নি বলে অনেকটা নিরব প্রতিবাদেই বেতারের ট্রান্সক্রিপশন পরিচালক হিসেবে তিনি বেতার ত্যাগ করেন। ১৯৭৩ সালে ২০ জানুয়ারি পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন, যোগ দেন দৈনিক *জনপদ* নামে একটি নতুন পত্রিকায়। তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হন।

১৯৭৪ সালে দৈনিক জনপদ ছেড়ে দৈনিক *বঙ্গবার্তা*য় যোগদান করেন। মওলানা ভাসানী সমর্থিত এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমেদ। প্রায় তিন মাস পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে কামাল লোহানী দৈনিক *বাংলার বাণী* পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ বছরই তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নির্বাচনে জয়লাভ করে।

সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র অ্যানালমেন্ট অধ্যাদেশ জারি করে মাত্র চারটি পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। নির্মল সেন ও কামাল লোহানী বাকশালে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় চাকরিহারা কামাল লোহানী খুবই অর্থকষ্টে পড়েন।

১৯৭৭ সালে ৬ জানুয়ারি সরকার তাঁকে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত *দৈনিক বার্তা*র নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত করে ঢাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। ১৯৭৮ সালে তাঁকে সম্পাদক পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

১৯৮১ সালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রীর সাথে মতবিরোধ হলে *দৈনিক বার্তা* ছেড়ে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট (পিআইবি)-এর প্রকাশনা পরিচালক ও *ডেপথনিউজ* বাংলাদেশ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমাস পরেই তিনি পিআইবির অ্যাসোসিয়েট এডিটর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৯১ সালে তিনি শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ষোল মাসের মাথায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাথে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পিআইবিতে ফিরে আসেন। কিন্তু পিআইবির মহাপরিচালক তাঁকে জোরপূর্বক অবসরে পাঠান। এই সময় রাজনৈতিক অভিযাত্রার পাশাপাশি যুক্ত হলো সংস্কৃতি সংগ্রাম। কামাল লোহানী ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে মহাজোটের বিজয়ের পর আবারও দু'বছরের জন্যে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি

এখন পর্যন্ড় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত থেকেছেন এবং আছেন।

কামাল লোহানী ৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একুশের চেতনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীন বাংলা বেতার পরিষদের উপদেষ্টা, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা। ১৯৮৩ সালে কামাল লোহানী সরাসরি জড়িত হয়ে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা গঠন করেন এবং ঐ সংগঠনের সভাপতি হন। সবকিছুর পাশাপাশি কামাল লোহানী 'আমার বাংলা' নামে শিল্প-সংস্কৃতি গবেষণা ও অনুশীলন চক্র গঠন করেছেন। বর্তমানে তিনি দেশের বৃহত্তম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর লেখা *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *আমরা হারবো না* এবং *লড়াইয়ের গান* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর লেখা নিয়ে *সত্যি কথা বলতে কি* এবং কবিতার বই *দ্রোহে প্রেমে কবিতার মতো* প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। ২০১১ সালে প্রকাশ পায় *সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৃত্যশিল্পের বিস্ড়ার ও রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার* বই দুটি। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবী, এর প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নিজের লেখার সংকলন *শত্রু বধের উৎসবে* এবং বরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে নিজের লেখার সংকলন *যেন ভুলে না যাই* বই আকারে প্রকাশ পাবে খুব শিগগীর। তিনি বর্তমানে স্মৃতিকথা লেখায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

বাংলা একাডেমি ফেলো কামাল লোহানী জাহানারা ইমাম পদক পেয়েছেন ২০০৮ সালে। কলকাতা পুরসভার দ্বিশতবর্ষ সম্মাননা পেয়েছেন তিনি ১৯৯১ সালে। প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক সম্মাননা এবং রাজশাহী লেখক সংঘ সম্মাননা পান তিনি। এ ছাড়া ক্রান্ড়ি শিল্পী গোষ্ঠীর ক্রান্ড়ি স্মারক ২০০৩, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর ঋষিজ সম্মাননা ও স্মারক সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা তাঁর মিলেছে।

কামাল লোহানী ও দীপ্তি লোহানী দম্পতির এক পুত্র ও দুই কন্যা। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সংশি ষ্ট। পুত্র সাগর লোহানী পেশায় সাংবাদিকতা এবং চিত্র নির্মাণের সাথে যুক্ত। জ্যেষ্ঠ কন্যা বন্যা লোহানী চাকরির পাশাপাশি 'শ্রুতিনন্দন কলা কেন্দ্র' পরিচালনা করছেন এবং কনিষ্ঠ কন্যা ঊর্মি লোহানী দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মের অনলাইন আর্কাইভ 'গুণীজন ডট কম' পরিচালনায় সম্পৃক্ত ।

যিনি আজীবন সম্মাননা পেলেন

নূরজাহান বেগম

নূরজাহান বেগম এদেশের নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। সাংবাদিকতার মতো একটি দুরূহ-কঠিন পেশাকে আজীবন সঙ্গী করে তিনি দুস্ড়র পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কখনও ক্লান্ড় হন নি এবং পথ হারান নি। বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি কিংবদন্ড়ী কলমসৈনিক নূরজাহান বেগম অক্লান্ড় এক অগ্রপথিক নারী সাংবাদিক। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ছিলেন নূরজাহান বেগমের পিতা।

উনিশ শতকের চলি শ ও পঞ্চাশের দশকে এদেশের বাঙালি নারীদের জন্য টিকে থাকার চেয়ে হারিয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। আর বাঙালি মুসলমান নারী মানে অন্দ্ড়পুরের বাসিন্দা। কিন্তু নূরজাহান বেগম ছিলেন এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বাবা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের হাত ধরে তিনি সাংবাদিকতার মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় পা রাখেন। আর পরম আগ্রহভরে নিজ কাঁধে তুলে নেন এ দেশের মেয়েদের জন্য প্রকাশিত প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক *বেগম*-এর দায়িত্বভার।

নূরজাহান বেগম চাঁদপুরের মেঘনা পাড়ের গ্রাম চালিতাতলিতে ১৯২৫ সালে ৪ জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। নূরজাহান বেগমের স্কুলজীবনের শুরু হয় অনেকটা হুট করেই। সে সময় বাঙালি মুসলমান মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার পেছনে বেগম রোকেয়ার অবদান ছিল অপরিসীম। নূরজাহান তখনও বেশ ছোট। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একদিন নূরজাহান বেগমের পিতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে ফোন করে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অনুরোধ জানালে মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বাবা *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বিশেষ উদ্যোগী হয়ে মেয়েকে স্কুলে পাঠান।

শৈশব থেকেই নূরজাহান বেগম বাবার আদর্শে বড় হন। স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার শুরু হয় ছোট বেলাতে। সেলাই, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, বিতর্ক কিংবা অভিনয় – সবক্ষেত্রেই নূরজাহান বেগমের পদচারণা। তার স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার পেছনে একদিকে যেমন সহায়ক ছিল স্কুলের আধুনিক শিক্ষা, অন্যদিকে প্রগতিশীল বাবার সাহচর্য। স্কুলজীবনেই বাবা তাঁর হাতে তুলে দেন

বিভিন্ন রকমের বই ও পত্র-পত্রিকা। সেই থেকেই পড়াশুনার প্রতি তাঁর যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা তিনি সারা জীবন ধরে রেখেছেন।

পড়াশোনা আর নির্মল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ তিনি লাভ করেন তাঁদের বাসায় কবি সাহিত্যিকদের নিত্যদিনকাল আড্ডা থেকে। পিতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বাসায় কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমেদ, ওয়াজেদ আলী খান, মোঃ মইনুদ্দীন প্রমুখ খ্যাতনামা সব কবি সাহিত্যিকবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন সে আড্ডায়। সেসব আড্ডার সুফল শৈশব-কৈশোরে ভালভাবে না বুঝলেও তখনকার অভিজ্ঞতার ভাবনাগুলোই পরবর্তী সময়ে নূরজাহান বেগমকে আরো বেশি করে ভাবতে শিখিয়েছে।

নূরজাহান বেগম ১৯৪২ সালে মেট্রিক পাশ করে ভর্তি হন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। আর এই কলেজ থেকেই তিনি আইএ এবং বিএ পাশ করেন।

সওগাত পত্রিকা সম্পাদনার কাজে বাবাকে তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেন সেই ছোটবেলা থেকেই। তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয় ১৯৪৫ সাল থেকে। সে সময় প্রতিবছর একবার *সওগাত* পত্রিকার বিশেষ মহিলা সংখ্যা বের হতো। 'জানানা মহল' নামে মেয়েদের জন্য আলাদা একটি বিভাগও চালু ছিল এই পত্রিকায়। 'জানানা মহল'-এর জনপ্রিয়তা থেকেই আসে মেয়েদের জন্য আলাদা একটি সাপ্তাহিক প্রকাশের ভাবনা। আর এই ভাবনার পথ ধরেই ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয় *বেগম*-এর প্রথম সংখ্যা।

সেসময় মেয়েদের জন্য প্রকাশিত স্বতন্ত্র পত্রিকা বলতে *বেগম*ই ছিল একমাত্র সচিত্র সাপ্তহিক। সেই সাতচলি শের পর থেকে আজ পর্যন্ড় সমান মান বজায় রেখে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক *বেগম*। প্রথমে *বেগম*-এর সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া কামাল এবং সেসময় নূরজাহান বেগম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে সুফিয়া কামাল পূর্ব পাকিস্ড়ানে চলে আসার পর নূরজাহান বেগম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে *বেগম*-এর কাজ হতো কলকাতার ১২ নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রিটের বাড়িতে। সে সময় শিশু, স্বাস্থ্য, গৃহস্থালির টুকিটাকি, রান্নাবান্না, সেলাই ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা ছাপানো হতো বেগম পত্রিকায়। সুপ্ত প্রতিভা ও স্বকীয় পরিচয়ে বেড়ে ওঠা কর্মসফল নারীদের নিয়ে নানা বিষয়ে এই পত্রিকায় লেখার সুযোগ তৈরি করে দেন তিনি। তাই সাপ্তাহিক *বেগম*-এর সুবাদেই এদেশে তৈরি হয় একঝাঁক নতুন নারী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। আর নারী জাগরণের এ অগ্রযাত্রায় *সওগাত* সম্পাদক বাবা নাসিরউদ্দীনের কাছে থেকে *বেগম* সম্পাদক নূরজাহান বেগম সব সময়ই প্রেরণা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করেছেন।

১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন ৬৬ নম্বর লয়াল স্ট্রিটের বিজয়া আর্ট প্রেসটি

নতুন করে শুরু হয় সওগাত প্রেস নামে। এখানেই ছিলো *বেগম*-এর অফিস। সে সময় মেয়েরা একা এসে পত্রিকা অফিসে লেখা দিয়ে যেতে পারতো না। তবে ডাকযোগে অনেক লেখা আসত। *বেগম*-এর একটা বড় সমস্যা ছিল ছবি পাওয়া নিয়ে। কারণ, মেয়েরা ছবি দিতে চাইত না। ফটোসাংবাদিকর সংখ্যাও ছিল খুব কম। নূরজাহান বেগম ঘরে ঘরে গিয়ে অনেকসময় ছবি সংগ্রহ করতেন। তবে ধীরে ধীরে সবার মধ্যে ধ্যান-ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে থাকে। *বেগম*-এর বিশেষ সংখ্যাগুলো পাঠকদের বেশ নজর কেড়ে নিত এবং তা প্রচুর পাঠকপ্রিয় ছিল। ১৯৪৮ সালে বের হয় *বেগম*-এর প্রথম ঈদসংখ্যা এবং ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বেগম 'বিশ্বনবী' সংখ্যা।

মেয়েরা একসঙ্গে বসে তাদেও সমস্যা-সম্ভাবনার বিষয়গুলো নিয়ে যাতে আলোচনা ও মতবিনিময় করতে পারে সে লক্ষ্য নিইে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'বেগম ক্লাব'। এই বেগম ক্লাবের মূল উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নূরজাহান বেগমের পিতা নাসিরউদ্দীন। ক্লাবের সদস্য লেখিকারা প্রথম দিকে প্রতিমাসে একবার একত্রে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। *বেগম* সম্পাদনার পাশাপাশি নূরহজাহান বেগম এই ক্লাবেরও সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দিকে বেগম ক্লাবের বেশিরভাগ আলোচনাই ছিল সাহিত্যকেন্দ্রিক। ধীরে ধীরে এর বিষয়বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। প্রবীণ শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নবীন শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা শুরু হয়। মেয়েদের পড়ার জন্য 'বেগম ক্লাব'-এ গড়ে তোলা হয় লাইব্রেরি। প্রবীণ লেখিকা ও সমাজসেবকদর সম্মাননা দেওয়া হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে এসে এ ক্লাবের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর ছোটদের পাতা 'কচিকাঁর আসর'-এর পরিচালক ছিলেন ছোট-বড় সবার প্রিয় দাদাভাই রোকনুজ্জামান খান। এক সময় *সওগাত*-এ রোকনুজ্জামান খানের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের নাম ছিল 'বৌ'। এ গল্প প্রকাশ হওয়ার পর নাসিরউদ্দীন তাকে প্রায় ঠাট্টা করে বলতেন, 'কি হে তোমার বৌয়ের খবর কী?'। এই রোকনুজ্জামান দাদাভাইয়ের সাথে ১৯৫২ সালে নূরজাহান বেগমের বিয়ে হয়।

ভাষা আন্দোলনের সময় আন্দোলন সম্পর্কিত খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতো *বেগম* পত্রিকায়। নূরজাহান-দম্পতি এ সময় বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'কচিকাঁচার আসর' সংগঠনটির যেসব তরুণ পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিল তারা আসত নূরজাহান বেগমের বাসায়। পরোক্ষভাব মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন নূরজাহান বেগম।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লেডি ব্রেবোর্নেও শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছেন নূরজাহান বেগম। ১৯৪৭-৪৮ সালে নূরজাহান বেগমসহ মুসলিম মেয়েরা প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত মঞ্চে নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেন। আর সেই নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া সব টাকা দেয়া হয় কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার জন্য। দেশবিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে ফিরে সমাজসেবায় নিয়োজিত হন নূরজাহান বেগম। তিনি ওয়ারী মহিলা সমিতি, গে ারিয়া মহিলা, নিখিল পাস্ড়িান মহিলা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতিসহ বহু সংগঠনের হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। এছাড়াও দেশের আরও অনেক সংগঠনের হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন নূরজাহান বেগম। আজীবন তিনি বিপন্ন ও আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন।

আজীবন কর্ম অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেগম সম্পাদক নূরজাহান বেগম লাভ করেন বেগম রোকেয়া পদক, বাংলাদেশ মহিলা সাংবাদিক ফোরাম পদক, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি পদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পদক, সরোজিনী নাইডু স্মৃতি পরিষদ পদক, কমর মুশতারি পদক, কাজী মাহবুবউল াহ ও বেগম জেবুন্নেসা ট্রাস্টের স্বর্ণপদক, রোটারি ক্লাব পদক ইত্যাদি। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ড় নূরজাহান বেগম এখনো *বেগম*-এর হাল ধরে আছেন। বিরামহীন পথচলা এখনো নিরন্ড়রভাবে লিখে চলেছেন এই কলম সৈনিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবগঠিত সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট তাঁকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করছে।

যাঁর নামে ট্রাস্ট
আবদুস সালম

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও অনেকের মতো যে মানুষটি অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন কলম দিয়ে সেই কলমযোদ্ধা পথিকৃৎ সাংবাদিকের নাম আবদুস সালাম। পাকিস্ড়ান আমলের বিরোধী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত *দি পাকিস্ড়ান অবজারভার* তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব পাকিস্ড়ানের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার ছিল তা এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সুদীর্ঘ সময় ধরে দুঃসাহসিকভাবে এই পত্রিকাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সম্পাদক আবদুস সালাম। স্বাধীনতার পূর্বে *দি পাকিস্ড়ান অবজারভার* এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে *দি বাংলাদেশ অবজারভার*-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি এই পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিক আবদুস সালামের মধ্যে ছিল জ্ঞানের গভীরতা। পাণ্ডিত্য আর প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সত্য প্রকাশের দুরন্ড় সাহস, পেশাগত নির্ভীকতা ও একনিষ্ঠতা তাঁকে এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে অধিষ্ঠিত করেছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং পথিকৃৎ সাংবাদিকরূপে।

নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে ১৯১০ সালের ২ আগস্ট আবদুস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দলিলুর রহমান ও মাতার নাম আজিজুন নেছা চৌধুরানী। আবদুস সালাম ফেনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি এবং ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

আবদুস সালাম কর্মজীবন শুরু করেন ফেনী কলেজের ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে। অতঃপর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে সরকারের আয়কর বিভাগের চাকরিতে যোগ দেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি সিভিল সাপ াই ডিপার্টমেন্টে এবং অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাঙালি অফিসারসহ সমস্ড় বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্ড়ানের জনগণের ওপর যে অত্যাচার-অবিচার চলছিল তার প্রতিবাদ জানাতেই মূলত তিনি সরকারি চাকরিরত অবস্থায় কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। *পাকিস্ড়ান অবজারভার*-এ 'ইকোনমিক নোটস' নামে ছদ্মনামে তিনি একটি কলাম লিখতেন তখন। তাঁর এই কলামের মাধ্যমে তিনি পাকিস্ড়ানের দু'অংশে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কেন প্রয়োজন তা খুবই শাণিত যুক্তি ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরতেন। ছদ্মনামে লিখতেন বলে পাঠকদের মধ্যে খুব কম লোকই জানতেন সেই জনপ্রিয় কলামটির লেখকের আসল নাম।

এই কলাম এবং সেইসঙ্গে *পাকিস্ড়ান অবজারভার* পাঠকমহলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। পত্রিকাটি ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্ড়ানি পাঠকদের কাছেও পূর্ব পাকিস্ড়ানের সেন্টিমেন্ট দিনে দিনে স্পষ্ট হতে থাকে। বলা যেতে পারে, 'ইকোনমিক নোটস' কলামটির মাধ্যমেই আবদুস সালাম সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। সেসময় মাঝে মাঝে তিনি *অবজারভার*-এর জন্য সম্পাদকীয়ও লিখতেন।

এই শাণিত কলাম সৈনিক মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে রক্ষার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই এক পর্যায়ে সরকারি চাকরি ছেড়ে সার্বক্ষণিক সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্ড়ফা দিয়ে *পাকিস্ড়ান অবজারভার*-এ যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালের ৩ জুন তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ড় তিনি অফিসেই থাকতেন। তিনি নিজে লিখতেন, অন্যের লেখা পরিমার্জনা করতেন, পত্রিকা নিয়ে পরিকল্পনা করতেন। এভাবেই তিনি কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে *পাকিস্ড়ান অবজারভার*কে একটি শীর্ষস্থানীয় কাগজে পরিণত করেন।

আবদুস সালাম ছিলেন নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে প্রকাশ পেয়েছে এই গুণটি। ১৯৬৩-৬৪ সালে আইয়ুব সরকার প্রণীত সংবাদপত্রবিরোধী কালা-কানুনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সে সময়ের ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রচিত গ্রন্থ *ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস*-এ বাঙালিদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্ড়ব্যের সমালোচনা ও নিন্দা প্রকাশ করেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সরকারে বিরুদ্ধে একজন সাংবাদিক হিসেব আবদুস সালাম যেভাবে লড়াই করেছেন তা এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। তাছাড়াও সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় জীবনে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন *পাকিস্ড়ান অবজারভার*-এর অদ্বিতীয় সম্পাদক। সে সময়ে পত্রিকাটি তদানীন্ড়ন পূর্ব পাকিস্ড়ানের স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন যা তৎকালনি মুসলিম লীগ সরকারের মনঃপুত ছিল না।

সরকার তখন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল পত্রিকাটি বন্ধ করার জন্য। আবদুস সালামের 'Crypto Fascism' সম্পাদকীয় প্রকাশের পর মুসলিম লীগ সরকার সেই সুযোগ পেয়ে যায়। তাঁর সম্পাদকীয় মুসলমানদের সত্তাকে আঘাত করেছে এই অভিযোগ এনে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি আব্দুস সালাম এবং পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের আগে আবদুস সালাম রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হন এবং যুক্তফ্রন্টের মনোনীত সদস্য হিসেবে ফেনী উত্তর আসন থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর *পাকিস্তান অবজারভার*-এর প্রকাশনা আবার শুরু হয় এবং আব্দুস সালাম এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তখন সমগ্র পাকিস্তানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

পূর্ব পাকিস্তান আইন পষিদের সদস্য নির্বাচিত হলেও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে মানিয়ে নিতে পারেন নি। এমতাবস্থায় তিনি পেশাদার সম্পদক হিসেব *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদনায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে কয়েক বছরের মধ্যেই *পাকিস্তান অবজারভার* সাংবাদিকতা জগতে গতানুগতিক ধারার বিপরীতে প্রযুক্তি-কৌশল এবং পেশাগত ধ্যান-ধারণায় একটি আধুনিক ও জনপ্রিায় ধারা তৈরি করতে সম হয়। সাংবাদিকতায় নবতর ধারা সংযোজনের পাশাশাশি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে পত্রিকাটি এ সময় ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে যা ক্রমশ বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়।

সমগ্র পাকিস্তানে নেতৃস্থানীয় সম্পাদক হওয়ায় আবদুস সালাম ১৯৬৩-৬৪ সালে ‘পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদনা পরিষদ’-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত তিনি একটানা ২২ বছর *পাকিস্তান অবজারভার*-এর সম্পাদক ছিলেন। পাঠকদের কাছে অবজারভার আর ‘আবদুস সালাম’ নাম দুটি যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সে সময় ইংরেজি পত্রিকা হিসেবে পাকিস্তান অবজারভার যে মর্যাদা ও কৌলিন্য লাভ করেছিল তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর মতো একজন সুশিক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান সম্পাদকের নেতৃত্বের বদৌলতে।

বাংলাদেশে স্বাধীন হবার পর সরকার *পাকিস্তান অবজারভার* পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। নতুন নাম হয় *বাংলাদেশ অবজারভার*। তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক পদে বহাল থাকেন। তবে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তখন এক অর্থে সরকারি পত্রিকা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সারা দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর তিনি তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বিশৃঙ্খখল পরিস্থিতির পটভূমিতে তাঁরই সম্পাদিত এই

পত্রিকায় 'The Supreme Test' (১৫ই মার্চ, ১৯৭২) শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখেন। এই সম্পাদকীয়তে তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি মন্তব্য করেন: "The Awami League Government is Today in a peculiar position. Although the party was elected overwhelmingly by the people, the government we have today is not an elected representative and constitutional Government, because of the fact that there is no constitution yet and there is, therefore, no democratic legal basis for its existence. It holds office by virtue of coming out victorious in a revolutionary war and is therefore a revolutionary, provisional government ..."

নাতিদীর্ঘ এ সম্পাদকীয়র মূল বক্তব্য ছিল: যদি আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে অতি শীঘ্রই একটি সংবিধান প্রণয়ন করে নির্বাচন এর আয়োজন করতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এর বৈধতা আনতে হবে। আওয়ামী লীগের বিশ্বাস তারা জনপ্রিয়। কিন্তু সুপ্রিম টেস্টের মাধ্যমে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্যিই জনপ্রিয়।

কিন্তু সরকারের কাছে এই সম্পাদকীয় গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়, সৃষ্ট মতিবিরোধের এক পর্যায়ে তাঁকে *বাংলাদেশ অবজারভার*-এর সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

সাংবাদিকতা পেশা থেকে অবসর নেয়ার পর মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় (*মর্নিং নিউজ, বাংলাদেশ টাইমস, ইত্তেফাক*) উপ-সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর আর কোন সক্রিয় যোগাযোগ লক্ষ করা যায়নি।

আব্দুস সালাম স্বীয় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও পেশাগত দৃঢ়তার কারণে সাংবাদিক সমাজে শ্রদ্ধার আসনে অনন্তকাল ধরে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, নীতিবোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সুদীর্ঘ সময় ধরে *পাকিস্তান অবজারভার*কে একটি বিশিষ্ট দৈনিকে পরিণত করেছিলেন। সাংবাদিকতার মান ও ইংরেজি ভাষার যথার্থ ব্যবহারে *পাকিস্তান অবজারভার* শুধু পাকিস্তানেই নয়, বিদেশেও বিশিষ্ট দৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সাংবাদিকতা পেশায় সরাসরি সম্পৃক্ত না থেকেও তিনি *অবজারভার*-এর সূচনাকালে যেসব ইংরেজি সম্পাদকীয় লিখতেন তা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল মূলত ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানার কারণে। ইংরেজি ভাষায় শুধু নয়; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা যে কত গভীর ও প্রখর ছিল তার প্রমাণ *অবজারভার*-এ লেখা তাঁর ‘ইকনোমিক নোটস’ কলাম। হিউমারিস্ট হিসেবেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এ ছাড়া ‘মাল্স’ ছদ্মনামে তিনি

‘আইডল থটস্’ শিরোনামে একটি ব্যঙ্গাত্মক কলাম লিখতেন। স্যাটায়ার রচনায়ও তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৭৬ সালে দেশবরেণ্য সম্পাদক আবদুস সালাম ‘একুশে পদক’ পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৭৬ সালে কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ ও গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরই তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট-এর প্রথম মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ১৯৭৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

যাঁর উদ্যোগে ট্রাস্ট

এবিএম মূসা

সাংবাদিক, কলাম লেখক আবুল বাশার মুহাম্মদ (এবিএম) মূসা বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় প্রবাদতুল্য পুরুষ। পঞ্চাশ দশক থেকে আজ অবধি দেশের সংবাদ মাধ্যমের ক্রমবিবর্তনের পথে যাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলছেন এবিএম মুসা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার কুতুবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশরাফ আলী ছিলেন সে সময়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার মার নাম মাজেদা খাতুন। তারুণ্যের শুরুতেই রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে শিহরিত করতো। তিনি জীবনকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন ভিন্নমাত্রায়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাবার বদলির সুবাদে চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মোসলেম হাই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেছেন এবিএম মূসা। ১৯৪৫ সালে তাঁর বাবা আবার নোয়াখালী ফিরে এলে নোয়াখালী জেলা স্কুল ভর্তি হন তিনি। ১৯৪৬ সালে তিনি এ স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

কলেজ জীবন থেকেই এবিএম মূসা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। চৌমুহনী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে তিনি *কৈফিয়ত* নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এছাড়া ফেনীতে খাজা আহমদের সাপ্তাহিক *সংগ্রাম*-এও নিয়মিত লিখতেন। এরপর বিএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে ঢাকায় এসে তিনি *ইনসাফ* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। পেশাগত সাংবাদিকতার শুরুর দিকে একদল সাংবাদিক বের হয়ে আসেন, তাদের অনেকে যোগ দেন *ইনসাফ* পত্রিকায়। এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন কে.জি. মুস্তফা। এই *ইনসাফ* পত্রিকায় তিন মাস কাজ করার পর এবিএম মূসা শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে ১৯৫০ সালের নভেম্বরে *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দেন। অ্যাডভোকেট শেহাবুদ্দিন আহমদ তখন *অবজারভার*-এর নামমাত্র সম্পাদক, মূল কাজ করতেন আবদুস সালাম। সৈয়দ নূরুদ্দীন তখন *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছাপার কারণে *পাকিস্তান অবজারভার* বন্ধ হয়ে গেলে এবিএম মূসা দৈনিক *সংবাদ*-এ যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে আবার *অবজারভার* প্রকাশিত হলে সেখানে তিনি আবার সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটের বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনে যান তিনি। অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউজে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপে মা করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি *অবজাভার*-এর সনাতনী চেহারা বদলে দেন। সেখানে যুক্ত করেন নতুন বিষয় ও নবতর অঙ্গসজ্জা। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন। বার্তা সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তাই পাকিস্তান *অবজারভার*কে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব বাঙালির মনের কথা জানতে পারতো *পাকিস্তান অবজারভার* পড়ে। ৬০-এর দশক এবিএম মূসা বাংলাদেশের পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি ইকোনমিস্ট*সহ বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমের বাংলাদশ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লন্ডন *টাইমস*-এর প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্সের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে হ্যারল্ড ইভান্সের উদ্যোগ এবিএম মূসা হংকংয়ে যান। আবার হ্যারল্ড ইভান্সের পরামর্শ মোতাবেকই সেখান থেকে মুজিবনগরে গিয়ে যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করে বিদেশি গণমাধ্যমে পাঠাতেন। হংকংভিত্তিক বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে এবিএম মূসা ভারত থেকে যুদ্ধের খবর *বিবিসি*কে জানাতেন। কেননা একাত্তরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে *বিবিসি*র কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে শেষে দেশে ফিরে আর কোন পত্রিকায় যোগ দেননি এবিএম মূসা। এ সময়ে তিনি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর তিনি *বাংলাদেশ টেলিভিশন*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পান। এর কিছুদিন পর তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে এবিএম মূসা আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি আবার লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি *সানডে টাইমস* পত্রিকার রিসার্চ ফেলোর কাজ পান। বিদেশে তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইউএসইপির আঞ্চলিক তথ্য পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচলক এবং তারপর বার্তা সংস্থা *বাসস*-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচলক পদে কাজ করেন।

*প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রমানের অনুরোধ ও উৎসাহে এবিএম মূসা কলামিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৯৫ সালের ১৮ মার্চ *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর প্রথম কলাম 'আবদুল গাফফার চৌধুরী বন্ধুবরেষু' ছাপা হয়। এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক *কুরিয়ার*-এও তিনি দুই বছর লিখেছেন। ১৯৯১ সালে *নিউজ ডে* নামে একটি ইংরেজি দৈনিকে সম্পাদক হিসেবে বছর খানেক কাজ করেন। ২০০৪ সালে কিছুদিন তিনি দৈনিক *যুগান্তর*-এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

এবিএম মূসা পাকিস্তানের সাংবাদিকদের ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। প্রয়াত এসএম আলী যখন ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পাকিস্তান জার্নালিস্টস ওয়েজ বোর্ডের সদস্য, এবিএম মূসা তখন ওই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে সময়েই প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর হয়।

১৯৬৫ সালে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চুক্তি সম্পাদন করা পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্ন কারণে এবিএম মূসা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুস সালামের বড় জামাতা। তাঁর স্ত্রী সেতারা মূসা, মেয়ে পারভিন সুলতানা ঝুমা প্রত্যেকেই সাংবাদিকতা পেশায় পরিচিত নাম। ২০১৪ সালে দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা পরলোকগমন করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

মোঃ আসাদুর রহমান

মোঃ রনি আহমেদ

মলয় কুমার দত্ত

ইমরান নাজির

মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদক আব্দুস সালাম ট্রাস্ট

'আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫'

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক আখতার সুলতানা, চেয়ারপার্সন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতি: অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আজীবন সম্মাননা: নূরজাহান বেগম।

স্মারক বক্তা: কামাল লোহানী।

তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

স্থান: অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আয়োজক: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।